বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ (বিআইএসআর) ট্রাস্ট -এর ইতিহাস

(২০০২-২০২৫)

ড. এম খুরশিদ আলম

বিআইএসআর-এর ইতিহাস

জানুযারী ২০২৬

১. ভাবনার কথা

আমি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান করার চিন্তা করি ১৯৮৪ সালে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদানের পর। সেখানে লক্ষ্য করি, ভারতে সীমিত পরিসরে পরিচালিত হলেও বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত মানসম্মত গবেষণাকর্মে নিয়োজিত। ১৯৮৫ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করে বাংলাদেশে এসে আমি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এ যোগদানের পর বুঝতে পারি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণার জন্য এটি একটি চমৎকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সামাজিক বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশে তেমন কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেই। এর আগেও আমি বিআইডিএস-এ যাই। তখন ভেবেছিলাম সেখানে কাজ করবো, কিন্তু পিএইচডি শেষ করার পর যখন গেলাম, দেখলাম সেখানে সামাজিক বিষয় নিয়ে গবেষণাতে তেমন কোনো আগ্রহ নেই। প্রতিষ্ঠানটি মূলত অর্থনৈতিক গবেষণার বিষয়ে আগ্রহী। তাদের প্রধান প্রাধান্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা।

ফলে সেখানে কাজ করার সুযোগ তেমন না দেখে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বি. কে. জাহাঙ্গীর পরিচালিত সেন্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজে গবেষক হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করি। কিন্তু সেখানে গবেষণা করার সুযোগের কথা জানতে চাইলে তারা বললেন, সেখানে কোনো গবেষক নেয়া হয়না। এরপর আমি নিজ উদ্যোগে কর্মসংস্থানের পথ খুঁজতে থাকি।

আমাদের বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. রঙ্গলাল সেনের পরামর্শে পুনরায় বিআইডিএস-এ গিয়ে ড. আতিউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে পূর্বপরিচিত ছিলেন না এবং আমার কাজ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য আমার থিসিস দেখতে চান। পরদিন আমি থিসিসের একটি কপি প্রদান করি। তিনি একদিনের মধ্যে তা দেখে তার পরের দিন বলেন, আমার থিসিস তার থিসিসের চেয়ে ভালো হয়েছে। এই মন্তব্য আমার জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ছিল। এরপর তিনি আমার জন্য কানাডীয় সিডার একটি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পে স্বল্পকালীন পরামর্শকের চাকুরির ব্যবস্থা করলেন। আমার দেয়া ল্যান্ড ফোন নম্বরে তিনি ফোন দিয়ে তার সাথে যোগাযোগ করতে বললেন। আমি বাসায় গিয়ে ল্যান্ড ফোন থেকে ফোন দিলে তিনি আমাকে জানালেন যে, আমার বেতন হবে ২২ হাজার টাকা, তার বেশি দেয়া যাবেনা। আমি বললাম, চলবে। আমি ভেবেছিলাম হয়তো এটি এক বছরের বেতন হবে কারণ তখন একজন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তার বা লেকচারারের বেতন ছিল মাসে ৭৫০ টাকা, সব মিলিয়ে হাজার খানেক টাকা।

তাহলে এটি এক বছরের বেতন হতে পারে। মনে মনে বললাম, যাই হোক আমি একটি কাজ শুরু করি। কাজে গিয়ে দেখলাম এটি এক মাসের বেতন, এক বছরের নয়।

এরপর ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে থাকি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি উপলব্ধি করি যে, একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যে ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, তা তখনো আমার অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সহজ নয়। আমি তখন পরামর্শকের চাকুরিতে পূর্ণ মনোযোগ দিই। কিন্তু কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে ভাবতে থাকি কীভাবে এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যায়? তবে এর জন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ পাওয়ার মতো ছিলনা। তাই ভাবলাম, তার জন্য আমাকে আরো অপেক্ষা করতে হবে।

পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পরামর্শকের কাজ করতে করতে ভাবতে থাকলাম, যেখানে কাজ করি সেখানে গবেষণার নতুন কিছু করা যায় কি-না? এটি বুঝতে পারি কিন্তু তেমন সুযোগ পাওয়া যায়নি। দু'য়েকজনের সাথে পরামর্শও করি। কিন্তু যে কাজ করি তাতে তেমন কোনো সুযোগ বের করা যায়নি। এদিকে আমার সময় চলে যাচ্ছে, তেমন কোনো ভালো প্রকাশনাও করা হয়নি। কারো কাজ থেকে তেমন কোনো সহযোগিতাও পাওয়া যাচ্ছিলনা। কি করা যায় কেবল সেটি মাঝে মাঝে চিন্তা করতে থাকি।

আমি চাই গবেষক হতে কিন্তু কাজ করছি পরামর্শকের। এর মধ্যে বেশ কিছু সময় দোটানায় চলে যায় অর্থাৎ কাজ করছি কিন্তু মন বসাতে পারছিনা। যদিও বুঝতে পারি যেখানে পরামর্শক হিসাবে কাজ করবো সেখান থেকে কিছু প্রকাশনার কাজ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে দু'একজন পরামর্শও দিয়েছিলেন কিন্তু তাদের পরামর্শ কাজে লাগানোর মতো অবস্থা ছিলনা। কারণ সিনিয়ররা তখনো নিজেরা খুব বেশি প্রকাশনা করতো না বিশেষ করে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা। আর যেগুলো এখানে করছে তা কেবল প্রমোশন পাওয়ার জন্য কিংবা হঠাৎ করার মতো। ড. আতিউর রহমানের সাথে কাজ করলেও তিনি নিজের প্রকাশনার প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন, আমাকে প্রকাশনার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেননি বা সাহায্যও করেননি।

আমি প্রথম যে কাজটি ড. আতিউর রহমান সাহেবের সাথে করি তা ছিল কানাডীয় সিডার জন্য। তা ছিল বিআরডিবি-এর গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (আরপিপি বা Rural Poor Program) জন্য গৃহিত একটি প্রকল্পের মূল্যায়ন। পরামর্শক হিসাবে প্রথম কাজ করার সময় বিত্তহীন সমবায় সমিতি এবং মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতির জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি স্বতন্ত্র এপেক্স বডি বা প্রতিষ্ঠান গড়ার পরামর্শ দিই। আমাদের দলনেতা তখনকার তরুণ অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান এ বিষয়ে একটু সংশয়ী ছিলেন। তিনি প্রথমে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মিটিং-এ এটি ডিফেন্ড করতে পারবেন কিনা? আমি দৃঢ়তার সাথে বলি, তা পারবো। এর আগে আমি কখনো

সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে কোনো নীতি-নির্ধারণী মিটিং করিনি। আমার বয়স তখন মাত্র ৩১। আমার যুক্তি ছিল খুব শক্ত, কারণ কুমিল্লা মডেল অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে বিআরডিবির কৃষক সমবায় সমিতি যেগুলো করা হয়েছে তাতে প্রতিটিতে ধনী কৃষকদের দৌরাত্ম্য ছিল বেশি। সেখানে গরীব বিশেষ করে বিত্তহীন পুরুষ এবং মহিলাদের তেমন স্থান নেই বললেই চলে। আমাকে জামালপুরের সরিষাবাড়ি উপজেলার উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বললেন, 'অফিসে এ সব ভিক্ষুক-টিক্ষুক এসে ঘুরাঘুরি করে এটি কি ভালো লাগে'?

আমি তখন অনুভব করলাম, যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা এ ধরনের মানসিকতা পোষণ করেন সেখানে কৃষক সমবায় সমিতির লোকেরা কী ধরনের মনোভাব পোষণ করবেন তা সহজে বুঝা যায়। তাই সারা দেশের প্রতিটি উপজেলায় যেন বিত্তহীন পুরুষ এবং মহিলাদের নিয়ে আলাদা একটি এপেক্স প্রতিষ্ঠান করা হয় তার জন্য জোর সুপারিশ করলাম এবং মিটিং-এ তা গৃহিত হলো। আজ সারা বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি (ইউবিসিসিএ লিঃ) তৈরী করা হয়েছে, প্রতিটি উপজেলায় এর একটি আলাদা ভবন রয়েছে।

আমি এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। সিডা, ডানিডা, বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি, বিআইডিএস, ইউএসএআইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক হিসাবে কাজ করি। সিডার ঐ কাজ করার সময় বুঝলাম, ওখানে থেকেও সীমিত আকারে গবেষণার কাজ করা যায়। আমি তখন আমার পরামর্শকের কাজ নিয়ে এগিয়ে যাই। কিন্তু অনেক জায়গায় তা করার সুযোগ সীমিত আকারে ছিল কিন্তু আমি তা যতদূর পারি কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। আর যখনই সুযোগ পেলাম সমাজবিজ্ঞানের আমার বাংলা বইগুলোর নতুন সংস্করণের কাজ চালিয়ে যাই; প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগ খুব সামান্য পাই। আমি ভাবলাম, যখন যেটা সুযোগ আসে সেটা কাজে লাগানো উচিত; কোনো একটি বিশেষ সুযোগের জন্য অপেক্ষা না করে। এভাবে যতদুর সম্ভব আমি গবেষণার কাজ করি। তবে লক্ষণীয়, কোনো অর্থ ছাড়া যে গবেষণা করা যায় বা সেকেন্ডারি ডাটা দিয়ে গবেষণা করা যায় সে বিষয়টি তখন আমার মাথায় তেমন কাজ করেনি। কারণ আমার মাথায় ছিল প্রাথমিক ডাটা দিয়ে গবেষণা করা।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে কাজ করার সময় আমার গবেষণার সুযোগ কিছুটা প্রসারিত হয়। সেখানে আমি একশন রিসার্চ শুরু করি এবং বেশ কিছু উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয় – যেমন, বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে খাল সংস্কার, সারা বছর বাঁধ ও খালের রক্ষণাবেক্ষণ, নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রণয়ন এবং চাহিদাভিত্তিক বাজেট প্রস্তুতকরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে পাঁচ বছর কাজ করার পর আরও দুই বছরের চুক্তি থাকা সত্ত্বেও আমি বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদে গবেষণার কাজে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমার তখনকার বেতনের তিন-ভাগের এক ভাগ বেতনে আগ্রহী হয়ে গবেষণা করতে গেলাম। কিন্তু দুঃখজনক হলো, সেখানেও তেমন কোনো গবেষণা হয় না; কিছু প্রজেক্ট পেলে সেগুলোর কাজ করে কর্মীদের বেতন চলে। কাউকে গবেষণার জন্য কোনো সুযোগও দেয়া হয়না, উৎসাহও প্রদান করা হয়না। ফলে একেক জন প্রতিভাবান আসে, আবার চলে যায়। তখন বসে বসে প্রায় এক বছর কাটালাম আর রাতে আমার পুরোনো বাংলা বইগুলো একেকটা এডিশন করার চেষ্টা করি। তারপর সেটি ছেড়ে দিয়ে আমি পরিকল্পনা কমিশনে পরামর্শকের কাজে চলে যাই।

পরিকল্পনা কমিশনে আমি একজন উচ্চমার্গের অর্থনীতিবিদের সংস্পর্শে আসি, যিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইজন নোবেল বিজয়ীর ছাত্র ছিলেন। যদিও তিনি নিজে গবেষণায় যুক্ত ছিলেন না, তবুও তার কাছ থেকে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল জানতে পারি। কিন্তু সেগুলো শিখলেও আমার তেমন লাভ হবে না কারণ আমি মূল অর্থনীতির ছাত্র নই। তাই তাঁর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আমি সেটি শিখতে আগ্রহী ছিলাম না।

পরবর্তীতে আমি এলজিইডিতে যোগ দিয়ে প্রকল্পভিত্তিক একশন রিসার্চে মনোনিবেশ করি। সেখানে একশন রিচার্স করার কথাটি আসে মুলত পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজ থেকে। মূলত কীভাবে জনগণকে জড়িত করে উন্নয়ন পরিকল্পনা করা যায়, তার একটি মডেল দাঁড় করালাম, বিশেষ করে হাট-বাজার, ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট ইত্যাদির উন্নয়নের জন্য ১০% টাকা জনগণ থেকে কিভাবে আদায় করা যায়। এটি বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে এক বছরের মতো সময় লেগে যায়।

এভাবে কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমি যেখানে সুযোগ পেয়েছি, সেখানেই একশনভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘ সময় ধরে সমাজের গভীরে গিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার ফলে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তা পরবর্তীকালে আমার তাত্ত্বিক গবেষণা ও জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। জাতীয় পরিকল্পনা তৈরির ক্ষেত্রে এসব অভিজ্ঞতা আমার বেশ ভালো কাজে লাগে।

২. শুরুর কথা

অবশেষে ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সেই সময় একজন ব্যক্তি আমাকে একটি কাজ প্রদান করেন, যার চুক্তিমূল্য ছিল ৮০,০০০ টাকা। এই অর্থ দিয়েই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু করি এবং তখন তা আমার কাছে একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্কের অর্থ বলেই মনে হয়েছিল। প্রথম জিগাতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে দারোগার মার্কেট নামে একটি বাণিজ্যিক ভবনের দ্বিতীয় তলায় মাসিক ২,৫০০ টাকা ভাড়ায় একটি কক্ষ

নেই। পরিচিত জন সবাই বলতে লাগলো যে, এত টাকা ভাড়া কোথায় থেকে দেবেন? তখনো আমি চাকুরি করতাম এবং বিকেল ৫টার পর সেখানে বসতাম রাত্রের ৯টা পর্যন্ত, তারপর বাসায় ফিরতাম। প্রাথমিক পর্যায়ে আগত ব্যক্তিরা যেন অফিস বন্ধ পেয়ে ফিরে না যান, সে উদ্দেশ্যে একজন সামান্য পড়াশুনা জানা নারীকে খণ্ডকালীন পিয়ন হিসেবে নিয়োগ দিই। তিনি প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত ৪০০ টাকা পারিশ্রমিকে অফিসটি খুলে রাখতেন এবং কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে বসার ব্যবস্থা করতেন।

পরবর্তীতে আমি আরেকজনকে নিয়োগ দিই, যিনি পূর্বে আমার অধীনে একটি প্রকল্পে সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং যাকে আমি বুদ্ধিমান মনে করতাম। তাকে ম্যানেজার পদে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এর আগে তিনি একটি এনজিওর পক্ষ থেকে যৌনকর্মীদের নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন। তাকে নির্দেশনা দেওয়া হয় যে, যখন কোনো কাজ থাকবেনা তখন সে যেন যৌন পল্লীতে যা দেখেছে তা লিখে। কিন্তু নানা অজুহাতে এক বছরের মধ্যে তিনি কোনো লেখালেখি করেননি; কেবল বিভিন্ন দপ্তরে প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেওয়ার কাজেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। তখনই আমি উপলব্ধি করি যে, মাঠ কর্মী হিসেবে কাজ করা আর কিছু লিখার সক্ষমতা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

আমি লক্ষ্য করি, তথ্যসংগ্রহের মতো মাঠকর্ম থাকলে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে কাজ করতেন, কিন্তু অন্যান্য গবেষণামূলক বা প্রাতিষ্ঠানিক কাজে তাঁর আগ্রহ ছিল সীমিত। তাকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দিলেও তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন এবং শেখার আগ্রহ দেখাননি। সম্ভবত তার ধারণা ছিল, কম্পিউটার শিখলে কাজ করা লাগবে। তখনও কোনো গবেষক ছিলনা। তাই তাকে বাদ দিয়ে ঢাবি থেকে সদ্য এমএসএস প্রথম শ্রেণীতে ২য় হওয়া একজন নবীনকে গবেষক হিসাবে নিয়োগ দিলাম, কিন্তু শর্ত দিল তার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি হয়ে যায় তাহলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবেন। আমি সে শর্তে সম্মতি প্রদান করি। ২০০৫ সালে আমি আমার নিয়মিত চাকরি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেই। তখন আমার মাসিক বেতন ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। আমি উপলব্ধি করি যে, চাকরি বজায় রেখে গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রচেষ্টা কার্যকর নয়; বরং পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে এ কাজে আত্মনিয়োগ করাই প্রয়োজন। তবে দুঃখজনকভাবে, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত গবেষক মাত্র তিন মাসের মধ্যেই একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পদে যোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ত্যাগ করেন।

এর মধ্যে আমি একজন পূর্ণকালীন পিয়ন নিয়োগ দিই। অল্প সময়ের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একক কক্ষের অফিসে তিনজনের বসার জায়গা নেই এবং তথ্যসংগ্রহকারীরা এলে তাদের বসার কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে পরবর্তীতে একই এলাকায় একটি ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিই, যেখানে মোটামুটি তিনটি কক্ষ ছিল। একটি কক্ষ প্রশিক্ষণ কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, অপর একটি কক্ষে আমি নিজে বসতাম এবং তৃতীয় কক্ষে একজন তরুণ গবেষক ও দুইজন

সহকারী কাজ করতেন। এভাবেই তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর পরিসরে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে অনেকের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তারা তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেননি। তাঁরা বলতেন, এটা একটি পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়, কয়দিন পর বন্ধ হয়ে যাবে। এমনকি বহু বছর পরও কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেছেন–আমি যে প্রতিষ্ঠানটি গড়েছিলাম, সেটি এখনও চালু আছে কি-না। আমি তাদের জানাই যে, প্রতিষ্ঠানটি এখনও সক্রিয় রয়েছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এটি ভবিষ্যতেও দীর্ঘদিন কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

৩. চলার কথা

নতুন কার্যালয়ে স্থানান্তরের পর প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম নতুনভাবে শুরু করি। বাস্তবতা ছিল এই যে, একটি কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর পরবর্তী কাজ পেতে প্রায়ই দুই থেকে তিন মাস সময় লেগে যেত। অর্থাৎ কার্যক্রম চলমান থাকলেও তার অগ্রগতি ছিল ধীরগতির। এই পর্যায়ে প্রকল্পভিত্তিক কাজের পাশাপাশি গবেষণাবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করি। তা থেকে নতুন অনেক শিক্ষা অর্জন করি। প্রথমত দেখা যায় যে, প্রতি ব্যাচে একজন বা দু'জন কিছুটা শেখার আগ্রহ প্রকাশ করে, আর বাকিরা মূলত সনদপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই অংশগ্রহণ করে। আমি যতই তাদেরকে গবেষণা পদ্ধতি শিখানোর চেষ্টা করলাম, তাদের এ বিষয়ে তেমন শিখার আগ্রহ দেখিনি। একদিন একজন মেয়ে প্রশিক্ষণার্থী আমাকে সাহস করে বললো, 'স্যার! আপনার এ ধারণা ভুল। তারা কেউ শিখতে আসেনি। তারা এসেছে মুলত একটি সনদপ্রাপ্তির জন্য যাতে কোনো একটি চাকুরি পেতে পারে'। আমাদের ফি ছিল ছয় হাজার টাকা, কেউ কেউ বাসায় মিথ্যা বলে এর খরচ বিশ হাজার টাকা নিয়ে নিজে খরচ করলো। আবার কেউ দশ হাজার টাকা বললো। এভাবে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো।

তাদেরকে রিপোর্ট লিখার জন্য ইংরেজি শিখাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখা গেল তারা তা করছে না। এভাবে প্রায় দশটি ব্যাচ সম্পন্ন করি। এর মধ্যে বিশেষ কিছু ব্যাচ পেলাম যারা গুরুত্বপূর্ণ, যাদের কয়েকজন পরবর্তীতে বিদেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার সুযোগ লাভ করে, আবার কেউ কেউ দেশে বা বিদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থায় অত্যন্ত উচ্চ বেতনে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। একজন এমনকি ১৬ হাজার টাকা বেতন থেকে ৬০ হাজার টাকা বেতনে চাকরি পেল। এভাবে অল্প কিছু ছাত্র অসম্ভব ভালো করলো আর কিছু ছাত্র কিছুই শিখতে পারেনি, এমনকি কেউ কেউ কোর্স সম্পন্ন না করেই চলে যায়। এদের মধ্যে যারা পেশাদারিত্বের জন্য শিখতে এসেছিল, তারাই তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করেছে। এটি দেখে আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান বা ঢাকার কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এ কোর্সটি চালু করে। তখন আস্তে আস্তে

আমাদের প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। তারা যখন দেখলো যে, তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের এখানে আসে কোর্স করতে, তারা তা চালু করে এবং আমাদের এখানে ছাত্র-ছাত্রী কমে যায়।

এদিকে ধীরে ধীরে আবার প্রতি মাসের তৃতীয় শনিবার কিছু ব্যক্তিকে সেমিনার দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো শুরু করি। প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ সাহেবকে মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়ে বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি খুব চমৎকার একটি বক্তৃতা প্রদান করেন, শ্রোতারাও বেশ প্রশংসা করলেন। তারপর বেশ কিছু ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারা বক্তৃতা দিলেন। কোনো কোনো সেমিনারে ভালো শ্রোতার উপস্থিতি থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে উপস্থিতি ছিল সীমিত। আবার এদিকে জার্নালটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। একসাথে তিনটি উদ্যোগ নিয়ে একসঙ্গে পরিচালিত হতে থাকে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখি; তবে বাস্তবতায় এক ধাপ অগ্রসর হওয়ার পর আবার কোনো কোনো সময়ে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। লোক নিয়োগ নিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হতে হয়।

প্রতিষ্ঠানের আয় সীমিত ছিল। নিয়মিতভাবে একজন পিয়ন, একজন গবেষণা সহকারী এবং একজন কম্পিউটার অপারেটর–এই তিনজন কর্মী নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতো। তাদের কোনো মাসে বেতন দেওয়া সম্ভব হলেও, অনেক সময় ব্যক্তিগত অর্থ থেকে কর্মীদের বেতন পরিশোধ করতে হয়েছে। এভাবে করে তাদেরকে নিয়ে ধীরে ধীরে কাজ চলেছে। তারপর আবারো একজন গবেষণা সহযোগী নিয়োগ করার চেষ্টা করি। আবার একজনকে নিলাম। তিনি ঢাবি থেকে সমাজবিজ্ঞানে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন, বললেন যে, তিনি গবেষণাতে আগ্রহী। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অন্যত্র চাকরি পেয়ে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন। এবার তাকে চলে যাওয়ার পর আরেকজনকে নিলাম। সে গবেষণা সহকারী।

এর মধ্যে একজন গবেষণা সহকারী তার পারিবারিক কারণে চলে গেল। সে ছিল প্রথম মহিলা কর্মী, হঠাৎ তার কাজের মেয়ে চলে যাওয়ার পর তাকে এক ঘন্টার মধ্যে চাকুরি ছেড়ে চলে যেতে হলো। তার একটি বাচ্চা ৮ মাসের এবং আরেকটি বাচ্চা তিন বছরের। এ'দুটো বাচ্চা তার কাজের মেয়ের কাছে রাখতো, পাশে তার মায়ের বাসা ছিল, সেখানে সে থাকতো। তার পরিবর্তে আর গবেষণা সহকারী না নিয়ে আবার গবেষক নিতে চাই। কোনো ব্যক্তি গবেষক হিসাবে নেয়া যাচ্ছেনা কারণ আসলে গবেষক হিসেবে কেউ কাজ করতে তেমন আগ্রহী না।

এর মধ্যে আরেকজনকে আবার গবেষণা ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ দিলাম যে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে গবেষণার কাজে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু এক বছরের মতো থাকার পর দেখলাম, ধীরে ধীরে তার বিভিন্ন অভ্যাসগত সমস্যা রয়েছে। সে নিদ্রাহীনতায় ভুগে এবং অফিসে আসতে

আসতে ১১টার উপরে বাজে। আবার তাকে অনেক কষ্টে করে বাদ দিলাম। এর জন্য আমাকে কিছু মাশুলও দিতে হলো।

২০০৮ সালে বাড়িওয়ালার প্রয়োজনে কার্যালয়টি ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। এরপর জিগাতলা সোনালী ব্যাংকের নিকটবর্তী একটি নতুন কার্যালয়ে স্থানান্তর করি। সেখানে বড় একটি রুম ছিল যেখানে অনায়াসে ৩০-৪০ জন পর্যন্ত বসতে পারে। আমার মাসিক সেমিনার করার সুযোগ আরো বেড়ে গেল। এদিকে সে অফিসে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সেমিনারের আয়োজন শুরু করি। এদের মধ্যে অন্যতম বক্তা হিসাবে অনেককে নিমন্ত্রণ করলাম। প্রাথমিকভাবে মাঝারি পর্যায়ের ব্যক্তিদের বেশি আমন্ত্রণ করা শুরু করি। কারণ খ্যাতনামা ব্যক্তিরা সাধারণত নানাবিধ ব্যস্ততার অজুহাতে সময় দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। দেখা গেল মাঝারি পর্যায়ের ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানালে শ্রোতা পাওয়া যায় না। আবার কিছু ক্ষেত্রে বক্তারা পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই উপস্থাপনা করতেন। অনেকে আবার গবেষণা ছাড়া কিছু বিষয় উপস্থাপন করেন। ফলে কোনো মাসে ভালো বক্তা পেলে আবার পরের মাসে আর পাওয়া যাচ্ছেনা। আবার দেখলাম ধীরে ধীরে শ্রোতা পাওয়া বেশ কঠিন। এদিকে এশিয়াটিক সোসাইটির বক্তৃতার অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম একই অবস্থা। তখন উপলব্ধি করি যে, এটি শুধু আমাদের সমস্যা নয়, এটি দেশের সকলের সমস্যা। জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় খুব কম শ্রোতা পাওয়া যায়।

সেখানে একটু প্রশস্ত জায়গা পাওয়ার কারণে প্রতি মাসের তৃতীয় শনিবার বিকেল ৪টায় একটি করে সেমিনার করতাম। এভাবে মোট তিন বছর সেমিনার করে গেলাম। সেখানে অনেক গবেষক স্বনামধন্য ব্যক্তি তাদের বক্তৃতা উপস্থাপন করলেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো ছিলো ড. আতিউর রহমান, আইটি বিশেষজ্ঞ মোস্তফা জব্বার যিনি পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন।

এদিকে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশনার চেষ্টা অব্যাহত রাখি। দেখা গেলো কোনো আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে একসেস না থাকার কারণে সেখানে প্রকাশনা করা সম্ভব হয়নি। তবে নিজস্ব একটি একাডেমিক জার্নাল চালু করি, যা প্রাথমিকভাবে কিছুটা সাড়া পেলেও দীর্ঘমেয়াদে তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ ধীরে ধীরে মানসম্মত লেখা পাওয়া কঠিন হলো। সর্বশেষ ২৪ টা লেখা পাওয়ার পরও তা থেকে একটি সংখ্যা বের করা কঠিন হলো। আবার ধীরে ধীরে অনলাইনে পাবলিশ করার বিষয়ে সকলে আগ্রহী হলো। আমরা মোট তিন ভলিয়মে ৬ ইস্যু বের করে মান সম্মত লেখা না পাওয়ার কারণে তা বন্ধ করে দিলাম। আমরা যেগুলো রিজেক্ট করলাম সেগুলো আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে বা দেশের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বা প্রতিষ্ঠানের জার্নালে প্রকাশিত হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট লেখকদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

আমাদের জার্নালটি সম্পূর্ণ ব্লাইন্ড রিভিউ পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। দেশি ও বিদেশি অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপকগণ সাধারণত রিভিউয়ার হিসেবে যুক্ত ছিলেন এবং একটি আন্তর্জাতিক সম্পাদকীয় বোর্ড এর তত্ত্বাবধানে কাজ করত। একটি আর্ন্তজাতিক এডিটরিয়াল বোর্ড ছিল। এটিতে মোটামুটি মান সম্মত প্রবন্ধ প্রকাশের চেষ্টা করেছি।

৪. গতির কথা

২০১০ সালে জিগাতলার কার্যালয়ের ভাড়া হঠাৎ প্রায় ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার পর আমরা ওই স্থান ত্যাগ করে লালমাটিয়া এলাকায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ততদিনে জিগাতলার সড়কগুলোতে অতিরিক্ত যানজটের কারণে যাতায়াত প্রায় অচল হয়ে পড়েছিল; এমনকি কোনো যানবাহন রাস্তায় থামানোও সম্ভব ছিল না। তাই ঐ বছর আমরা লালমাটিয়ায় অফিস স্থানান্তর করি। নতুন এলাকায় স্থানান্তরের ফলে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আয় বৃদ্ধির বিষয়টি নতুন করে ভাবতে হয়। প্রথমে খরচ বাড়ার সাথে সাথে ভাবলাম যে, আয় করার জন্য যদি পাশাপাশি আরো গবেষক নিয়োগ করি তাহলে তা হয়তো দ্রুত কাজ দেবে। তাই প্রথমে কিছু জুনিয়র গবেষক নিয়োগ করি। তাদেরকে নিয়ে আবার নতুন যাত্রা শুরু হয়।

এদিকে প্রথম থেকে বিআইএসআর এর সাথে অন্যদের যুক্ত করার নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল। তাই এ পর্যায়ে এসে আমরা কিছু গবেষককে উম্মুক্ত আহ্বান জানাই আমাদের সাথে গবেষণা করার জন্য। বেশির ভাগ যারা এলেন তাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিল। শুরুতে তাদের জন্য একটি এক দিনের ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হল। সেখানে তাদের প্রস্তাব দু'জন বিশেষজ্ঞের সামনে উপস্থাপন করার সুযোগ দেওয়া হয়। এরপর তাদেরকে প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত উন্নয়নের কৌশলসহ বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করা হয়।

শিক্ষক এবং সাধারণ গবেষকদের জন্য আমরা একটি ক্ষুদ্র গবেষণা অনুদানের (গ্রান্ট) উদ্যোগ গ্রহণ করি। দেখা গেল, তম্মধ্যে কেবল দু-একজন ছাড়া বাকী কেউ তা সম্পন্ন করলোনা। তারা কেউ সামান্য টাকা এডভান্স নিয়ে চলে গেল, কেউ ডাটা সংগ্রহ করে রেখে দেশের বাইরে চলে গেল, কেউ আবার কোনো রকমে তা শেষ করার চেষ্টা করলো যার মান খুবই খারাপ। ফলে আমাদের এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর আবার নতুন করে ভাবতে হলো, কীভাবে এর উন্নয়ন করা যায়।

আবার এদিকে স্থানীয় কয়েকটি জার্নালে কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করার পর দেশের বাইরে ভারতে একটি অতি পুরাতন গুরুত্বপূর্ণ জার্নালে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে সক্ষম হই। প্রধান সমস্যা ছিল বিদেশি গবেষণা প্রবন্ধগুলো পড়া এবং ডাউনলোড করার সুযোগ না থাকা। যথেষ্ট পরিমাণ

রেফারেন্স না দিতে পারলে বা রিভিউ করতে না পারলে এ সব জার্নালে প্রকাশনা করা সম্ভব হয় না। সেই সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের গবেষণা কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হচ্ছিল।

প্রতিষ্ঠানটির কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে এ পর্যায়ে এসে তিনটি বিষয় আমাদের সামনে চলে আসলো- ১. অর্থ সংগ্রহ; ২. আর্ন্তজাতিক প্রকাশনা এবং ৩. সম্ভাবনাময় গবেষকদেরকে ধরে রাখা।

অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল এই যে, সরকারি ও বিদেশি দাতা সংস্থাগুলো সাধারণত তাদের কাজ কনসাল্টিং ফার্মের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী। তাই আমাদের কিছু কিছু প্রস্তাব তারা প্রত্যাখান করে। এর সমাধান হিসেবে আমরা তখন এর পাশাপাশি একটি পৃথক কনসাল্টিং উইং প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। কনসাল্টিং ফার্ম হলে যেভাবে হোক আমাদের আয়ের সুযোগ বাড়বে, এতে গবেষকদের বেতন দেয়া এবং গবেষণাগুলো করার সুযোগ বাড়বে। এটি আমাদের কাজ পাওয়াকে সহজ করে দিবে। ফলে প্রতিষ্টানের অনেক খরচ সেখান থেকে মিটানো সম্ভব হয়। আর এর মাধ্যমে অন্যদের সাথে যোগাযোগ বাড়ানো সম্ভব হবে। এটি প্রতিষ্ঠানে কিছুটা গতি সৃষ্টি করে।

প্রকাশনা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় ধরনের সাফল্য আসে যখন নবীন গবেষকদেকে নিয়োগ করলাম। তারা মোটামুটি বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে বিদেশি প্রবন্ধ সংগ্রহ ও রেফারেন্স তৈরির সক্ষমতা অর্জন করে। ফলে ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশনা সম্ভব হয়। এটি মূলত ২০১৩ সালের দিকে প্রথম শুরু হয়। তখন আমরা তিনভাবে এটি সংগ্রহ করা শুরু করলাম, ১. অথরদের লিখা; ২. কোনো বন্ধু-বান্ধবকে তা ডাউনলোড করে পাঠানোর জন্য লিখা; এবং ৩. বিভিন্নভাবে তা ডাউনলোড করে নেয়া। এভাবে এক মহাসংকট দূর করা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে আমরা জেস্টোর (JSTOR)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা প্রথম বছরের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি বছরের জন্য দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফি দাবি করে। আমি তখন আমাদের আর্থিক সামর্থ্য চিন্তা করে প্রচলিত বিকল্প পথে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এভাবে এ দ্বিতীয় সমস্যার সমাধানও হয়।

সম্ভাবনাময় গবেষকদের ধরে রাখতে না পারার বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে হতাশ করত। তারা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরির জন্য অস্থির থাকতো এবং সুযোগ পেলে চলে যেতো। প্রাথমিকভাবে এটি ব্যক্তিগতভাবে কষ্টদায়ক মনে হলেও পরবর্তীতে অন্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বুঝতে পারি যে, এটি বাংলাদেশের প্রায় সব গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি সাধারণ সমস্যা। এর পর কি করা যায় তা নিয়ে ভাবতে থাকি। তখন ভাবলাম, কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করা

যায়। প্রথমে এর জন্য আমরা বেশ কিছু পিএইচডিধারী গবেষককে নিয়োগ করি। কিন্তু এ উদ্যোগটি প্রত্যাশার বিপরীত ফল দেয়। অর্থাৎ দেখা গেলো এরা কেউ গবেষণার জন্য পিএইচডি করেনি। বরং তারা সুযোগসন্ধানী বা নামমাত্র গবেষণার মাধ্যমে ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাদের বেতন ভাতা জোগাড় করতে গিয়ে আমাদের অনেক টাকা আরো ঋণ হয়ে গেলো। তারা কিছু যোগ করতে পারেনি। বরং আরো পিছনে ফেলে দিলো। এক বছর থেকে কোনো প্রবন্ধ কোনো আর্ন্তজাতিক জার্নালে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হন; এমনকি পত্রিকায় অপ-এড পর্যন্ত লিখতে পারেলানা। তারপর এদের বিদায় করা একটা দায়িত্ব হয়ে গেলো। তাদের বিদায় করা ছিল আরেক কঠিন কাজ। তাদেরকে একে একে নোটিশ দেয়া হলো। কিন্তু কারো এই সমস্যা, কারো ঐ সমস্যা ইত্যাদি শুনতে হলো। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে বিদায় করা সম্ভব হল।

কিন্তু প্রশ্ন হলো এর বিকল্প কি আছে? তখন ভাবতে ভাবতে এর একটি সমাধান বের করলাম। দেখলাম বিদেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের গবেষকের অভাব দূর করে কিছু খণ্ডকালীন বা সংযুক্ত গবেষক দিয়ে। আমি চিন্তা করলাম, তাহলে আমরা সংযুক্ত বা এডজাংকট রিসার্চ ফেলো যদি নিই তাহলে তাদের মাসিক বেতন দেয়া লাগবেনা কিন্তু তাদের কিছু টাকা দিলে তারা গবেষণা করতে পারবে। তারা যদি এভাবে আমাদের সাথে গবেষণা করে তাহলে আমরা আমাদের সাথে তাদের যৌথ গবেষণাও হবে; আবার আমাদের সাথে পাবলিকেশন্সও হবে। এতে আমাদের এখান থেকে যারা চলে গেছে তাদের কেউ কেউ আমাদের সাথে কাজ করা শুরু করলো।

এইভাবে ধীরে ধীরে অভ্যন্তরীণ গবেষক ও সংযুক্ত গবেষকদের সমন্বয়ে আমাদের প্রকাশনা কার্যক্রম গতি লাভ করে। যদিও সংযুক্ত গবেষকরা সব সময় সমান মাত্রায় অবদান রাখতে পারেন না, তবুও সামগ্রিকভাবে এটি আমাদের জন্য একটি কার্যকর ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা হিসেবে প্রমাণিত হয়।

এ গবেষণা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কোনো সহযোগিতা ছিল না কারণ প্রথম থেকে আমি চিন্তা করি যে, এটি কারো সহযোগিতা না নিয়ে করবো। পরে অবশ্য আমি শর্তহীনভাবে সরকারি বা বেসরকারি সহযোগিতা পেলে নিব বলে মনস্থির করি। তবে গবেষণার জন্য বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ পাই যা দিয়ে এ প্রতিষ্টানটি চালু রাখা সম্ভব হয়। আর যখনই বেতন-ভাতা দেয়ার সংকট দেখা দেয় তখন আমি আমার নিজ থেকে টাকা দিয়ে এটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখি।